সার্স রোগ ৩
শহরাঞ্চলে ডিপোহোল্ডার ৪
ডিক্স টেবলেট ৬
আর্সেনিকজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা ৯
বাংলাদেশ এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠী ১২

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ

বর্ষ ১২ সংখ্যা ১-৩ শ্রাবণ-চৈত্র ১৪১০

গর্ভধারণ এড়ানোর জন্য জরুরি ব্যবস্থা হিসেবে

ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল

মনোয়ার জাহান
রুখসানা গাজী

প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে ত্রুটি বা অনিয়মের কারণে বা পদ্ধতি ছাড়া সহবাসের পর কারো মনে যদি অপরিকল্পিত গর্ভধারণের সন্দেহ জাগে তবে জরুরি ভিত্তিতে ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল খেয়ে গর্ভধারণ রোধ করা যেতে পারে। ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল (ইসিপি) হলো একধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ি, যা অপরিকল্পিত গর্ভধারণ এড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। কোনো মহিলা যদি অনিবার্য কারণে অনিরাপদ সহবাস করেন এবং গর্ভবতী হতে না চান তখন তিনি গর্ভধারণ এড়ানোর জন্য ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ইসিপি ব্যবহার করতে পারেন। ইসিপি পরিবার পরিকল্পনার অন্যান্য পদ্ধতির মতো দীর্ঘ সময় ব্যাপী বা নিয়মিত ব্যবহার করা যায় না। শুধুমাত্র জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়।

ইসিপি হলো হরমোনাল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। ইসিপি-কে বলা হয় Morning-after অথবা Post-coital বড়ি। প্রায় সব মহিলার জন্য ইসিপি নিরাপদ। জন্মদানে সক্ষম সব মহিলাই ইসিপি ব্যবহার করতে পারবেন। যেসব মহিলাকে জটিলতার কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ি খেতে নিষেধ করা হয় তারাও ইসিপি ব্যবহার করতে পারবেন। ইসিপি গর্ভপাত ঘটায় না কিংবা গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি করে না। ইসিপি ব্যবহারের পর ভবিষ্যতে পুনরায় গর্ভবতী হওয়ার ব্যাপারে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না।

যদিও ১৯৭৯ সাল থেকে ইসিপি বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, এখন পর্যন্ত অনেক মহিলাই ইসিপি সম্বন্ধে বেশি কিছু জানেন না। ফলে দেখা যায় যে, অনেক মহিলা অপরিকল্পিতভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়েন, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে গর্ভপাত ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন। ফলে মহিলারা নানা রকম ঝুঁকিপূর্ণ জটিলতার সম্মুখীন হন।

বড়ি খাওয়ার সময় যেসব নিয়ম অবশ্যই মেনে চলতে হবে তা হলো:

- ❒ প্রথম ডোজ অনিরাপদ সহবাসের ৭২ ঘণ্টার (৩ দিন) মধ্যে খেতে হবে। তবে সহবাসের পর যত তাড়াতাড়ি বড়ি খাওয়া যায় বড়ির কার্যকারিতা ততই বেশি হয়
- ❒ দ্বিতীয় ডোজ প্রথম ডোজের ১২ ঘন্টা পর খেতে হবে
- ❒ কিছু খাওয়ার পরপরই বা ঘুমের আগে ইসিপি খাওয়া ভালো। প্রথম ডোজ এমনভাবে খেতে হবে, যাতে ঠিক ১২ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় ডোজ খেতে কোনো অসুবিধা না হয় (অর্থাৎ কোনো ডোজ ঘুমের সময় না-পড়ে)
- ❒ প্রথম ডোজ ইসিপি খাওয়ার ২ ঘণ্টার মধ্যে বমি হলে ঐ ডোজটি পুনরায় খেতে হবে। দ্বিতীয় ডোজের ১ ঘণ্টা

ইসিপি বা পস্‌টিনর-২ (Postinor tablet) খাবার নিয়ম

ইসিপি-র নাম	প্রথম ডোজ	দ্বিতীয় ডোজ
শুধু-প্রজেস্টেরন হরমোন বড়ি পস্‌টিনর-২ নামে পাওয়া যায়	অনিরাপদ সহবাসের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই খেতে হবে	প্রথম ডোজের ১২ ঘণ্টা পর খেতে হবে
	১টি বড়ি	১টি বড়ি

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টিবিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক কর্মকাঠামোও আইসিডিডিআর,বি'র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নত মানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	ডেভিড এ. স্যাক
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	এম. শামসুল ইসলাম খান
সম্পাদক	এম.এ. রহীম
সদস্য	আসেম আনসারী
	রুখসানা গাজী
	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
	মোঃ ইকবাল
	মোঃ সিরাজুল ইসলাম
	মাসুমা আক্তার খানম
	সুমনা লিজা
	মোঃ আনিসুর রহমান
	রুবহানা রকিব
	পিটার থর্প
মাস্ট হেড ডিজাইন	আসেম আনসারী
ডেস্কটপ প্রসেসিং ও প্রকাশনা	এম.এ. রহীম

প্রকাশক
আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
মহাখালি, ঢাকা ১২১২ (জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০)
বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২ ২৪৬৭, ৮৮১ ৭৭১-৬০
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৯৮৯ ৯২২৫ ও ৮৮২ ৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

মুদ্রণ: সেবা প্রিন্টিং প্রেস, মহাখালি, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ

আগে বমি-রোধক ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে মহিলাকে মোট ৩টি বড়ি খেতে হবে।

ইসিপি-র পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

ইসিপি ব্যবহারে কিছু কিছু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া রয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ির সেসব পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আছে ইসিপি গ্রহণেও সেগুলো দেখা দিতে পারে, যেমন:

- বমি-বমি ভাব
- বমি-হওয়া
- মাথাব্যথা
- মাথা ঝিম-ঝিম করা
- অবসন্নতা
- স্তনে ব্যথা
- কদাচিৎ কারো কারো ক্ষেত্রে অনিয়মিত মাসিক হতে পারে

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দূর করার উপায়

- ❒ উপরোল্লিখিত বেশির ভাগ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় ডোজের দু'একদিনের মধ্যে এমনিতেই সেরে যায়
- ❒ কিছু খাবার পর ইসিপি খেলে বমি-বমি ভাব বা বমি-হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে
- ❒ প্যারাসিটামল বা ব্যথার ওষুধ খেলে মাথাব্যথা বা স্তনের ব্যথা কমে যায়
- ❒ ইসিপি খাওয়ার আগে বমি না-হওয়ার জন্য প্রচলিত বমি-প্রতিরোধক ওষুধ খাওয়া যেতে পারে

যেসব পরিস্থিতিতে ইসিপি ব্যবহার করা যেতে পারে

যখন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, তখন ইসিপি খেতে হয়, যেমন:

- ❒ যদি কেউ পরপর ৩ দিন খাবার বড়ি খেতে ভুলে যায়
- ❒ যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের ইনজেকশন নিতে ১৪ দিনের বেশি দেরি হয়ে যায়
- ❒ যদি আজল পদ্ধতি (বীর্যপাতের আগে পুরুষাঙ্গ বের করে-আনা) ত্রুটিযুক্ত বা ব্যর্থ হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়
- ❒ যদি নিরাপদ-কাল গণনায় ভুল হয়
- ❒ যখন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় না, যেমন: যদি সহবাসের সময় কনডম ফেটে যায় বা স্থানচ্যুত হয়
- ❒ অনিচ্ছাকৃত বা জোরপূর্বক (ধর্ষণ) বা পদ্ধতি ছাড়া সহবাসের পর কোনো মহিলা অপরিকল্পিত গর্ভধারণ এড়াতে চাইলে ইসিপি ব্যবহার করতে পারেন

বাংলাদেশে কোথায় এবং কী হিসেবে ইসিপি পাওয়া যায়

পস্‌টিনর-২ নামে বাংলাদেশে ইসিপি পাওয়া যায়। সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে পস্‌টিনর-২ নামে তা পাওয়া যায়। এছাড়া ফার্মেসিতেও পস্‌টিনর-২ পাওয়া যায়।

সাবধানতা

- ❒ ইসিপি ব্যবহার করার পর কোনো প্রকার অসুবিধা হলে অবশ্যই ডাক্তারের সাথে বা নিকটস্থ স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে
- ❒ যদি সহবাস-পরবর্তী মাসিক নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ১ সপ্তাহের বেশি দেরিতে হয় তবে ক্লিনিকে বা হাসপাতালে প্রস্রাব পরীক্ষা করে জেনে নিতে হবে ঐ মহিলা গর্ভবতী হয়েছেন কি না

সূত্র: পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও পপুলেশন কাউন্সিল, বাংলাদেশ

সার্স রোগ

বাংলাদেশের জন্য সতর্কতা

স্বাস্থ্য সংলাপ প্রতিবেদন

গত বছর চীনদেশে সার্স রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তা পর্যবেক্ষণের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়েছিলো তার নেতৃত্বে ছিলেন আইসিডিডিআর,বি'র এসোসিয়েট ডিরেক্টর এবং হেলথ সিস্টেম্‌স্ এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশনের প্রধান ড. রবার্ট এফ. ব্রাইম্যান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও চীনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দানের নিমিত্তে এই দলটি ২০০৩ সালের মার্চ-এপ্রিলে চীনদেশে তাদের সার্স-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করে।

বেইজিং এবং গোয়াংডং প্রদেশে বিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত আলোচনায় ড. ব্রাইম্যান দলনেতা হিসেবে কাজ করেন। উল্লেখ্য যে, গোয়াংডং প্রদেশেই প্রথম এ-রোগ সনাক্ত করা হয়। সার্স রোগের মহামারীর ধরন সনাক্তকরণ ও জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সঠিক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে চীন সরকারকে সহায়তা দানের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দলটি সেখানে কাজ করে। সার্স রোগের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার জন্য ড. ব্রাইম্যান এরপর আরো একবার চীন সফর করেন।

২০০৩ সালের এপ্রিল-মে মাসে ড. ব্রাইম্যান বাংলাদেশেও বহু বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করেন। বাংলাদেশে সার্স রোগের সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে কী কী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে-বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বাস্থ্যসেবা দানকারী এবং অন্যান্যদের অবহিত করার জন্য এসব আলোচনার আয়োজন করা হয়।

আগে জানা ছিলো না এমন একটি কোরোনাভাইরাস দ্বারা এ-রোগের সূচনা ঘটেছে, যা ২০০৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে চীনের দক্ষিণাঞ্চলে প্রথম দেখা দেয় এবং বিশ্বব্যাপী আলোচনার ঝড় তোলে। চীনের দক্ষিণাঞ্চল থেকে রোগটি খুব দ্রুত সে-দেশের মূল ভূ-খণ্ডেও বিস্তৃত হয় এবং সেখান থেকে ক্রমে হংকং, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, সিংগাপুর এবং কানাডার টরোন্টো ও অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের সৌভাগ্য যে, বাংলাদেশে এ-রোগ এখনও দেখা দেয় নি। তবে চীনদেশে আলোচিত ও পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য বাংলাদেশে এ-রোগটিসহ অন্য কোনো নতুন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে, সনাক্তকরণে ও নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে। স্থল, সমুদ্র ও আকাশপথে যেসব লোক বাংলাদেশে প্রবেশ করছেন তাঁদের মধ্যে যাদের জ্বরসহ শ্বাসকষ্ট আছে তাঁদেরকে নিয়ন্ত্রণ করাই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি। বাংলাদেশে যথাসময়ে এ-বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিলো। কোয়ারেন্টাইন স্টেশন স্থাপনসহ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ঠিক করে রাখা হয়েছিলো।

ড. ব্রাইম্যানের মতে সার্স রোগের চিকিৎসায় কোনো ওষুধই সঠিকভাবে কার্যকর নয়। রিবাভিরিন দ্বারা প্রাথমিক চিকিৎসা এবং উচ্চমাত্রার কোর্টি-কস্টারয়েডজাতীয় ওষুধের কার্যকারিতা বিষয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। দেহনিঃসৃত তরলের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায় এবং সাধারণত আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শ রোগ বিস্তারের প্রধান কারণ বলে মনে করা হয়। এ-রোগের ভাইরাস কোনো বস্তুর শুষ্ক গাত্রে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে সক্ষম, যার ফলে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী এ-রোগের সম্ভাব্য বাহক বলে গণ্য করা হয়। তবে

চীনের একটি হাসপাতালে কড়া সাবধানতায় একজন সার্স রোগীর সাথে কথা বলছেন সে-হাসপাতালের ডাক্তার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যগণ

জনবসতির চেয়ে স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানে রোগটি দ্রুত বিস্তার লাভ করতে পারে বলে ধারণা করা হয়। এছাড়াও এপার্টমেন্ট, হোটেল, বিমান ও বিমানবন্দরসংলগ্ন জায়গাসমূহে এর বিস্তার ঘটতে পারে।

ড. ব্রাইম্যান বলেন, সার্স রোগের বিস্তার থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীতে যেকোনো নতুন ধরনের সংক্রামক রোগের জীবাণু যেকোনো সময় আবির্ভূত হতে পারে এবং দ্রুত রোগ ছড়াতে পারে।

ঘন বসতি, অপ্রতুল সামাজিক পরিচ্ছন্নতা, একই স্থানে অনেক ক্লিনিক ও হাসপাতালের উপস্থিতির কারণে বাংলাদেশে সার্স-এর মতো সংক্রামক রোগ দেখা দিলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা এ-দেশের জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এ-কারণে সার্স কিংবা এর মতো অন্য কোনো সংক্রামক রোগ যাতে ছড়াতে না পারে তার জন্য আগাম সতর্কতা ও মোকাবিলার প্রস্তুতি অত্যন্ত জরুরি।

চীনে প্রেরিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সার্স বিশেষজ্ঞ দলের প্রধান হিসেবে সেখানকার এক আলোচনা সভায় কথা বলছেন আইসিডিডিআর,বি-র বিজ্ঞানী ড. রবার্ট এফ ব্রাইম্যান

শহরাঞ্চলের একজন ডিপোহোল্ডারের কথা

মোঃ হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কর্মসূচি (এনএসডিপি)-এর আওতায় ৪১টি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) শহর এবং গ্রামের স্থায়ী ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় সেবা (ESP) প্রদান করছে। এই কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ এলাকায় প্রায় ৬,৫০০ মহিলা ডিপোহোল্ডার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু শহর-এলাকায় এধরনের উদ্যোগ বিরল। সম্প্রতি ইউএসএআইডি-এর আর্থিক সহায়তায় এনএসডিপি-এর আওতাধীন তিনটি এনজিও ঢাকা, শেরপুর ও বরিশালে পরীক্ষামূলকভাবে শহর-অঞ্চলেও ডিপোহোল্ডার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচি ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়েছে। এনএসডিপি ও আইসিডিডিআর,বি যৌথভাবে এই কর্মসূচির প্রাথমিক মূল্যায়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে যে, গবেষণালব্ধ জ্ঞান কর্মসূচিতে প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন সম্ভব হবে। এর আগে আইসিডিডিআর,বি-পরিচালিত অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে যে, ঢাকায় মহিলা কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবীগণ সেবা গ্রহণকারীদের অধিক হারে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিলেন।

একজন ডিপোহোল্ডারের রয়েছে প্রধান দু'টি দায়িত্ব: (ক) সেবা প্রদানকারীর দায়িত্ব এবং (খ) স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে দায়িত্ব

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব হলো: জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ি, কনডম, এবং স্যালাইন বিতরণ করা।

স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব নিম্নরূপ:

- ক্লিনিকে সহজপ্রাপ্য অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে এলাকাবাসীদের সচেতন করা
- নতুন দম্পতিদের এবং অন্যান্য সক্ষম দম্পতিদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত করা
- গর্ভকালীন সময়ে, প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী সেবা সম্পর্কে জনগণকে অবগত করা ও উদ্বুদ্ধ করা
- স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠনে এনজিও কর্মীদের/সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তা করা
- ক্লিনিকে এসে যেসব জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তায় গ্রহণ করতে হয় সেসব সম্পর্কে, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা সর্ম্পকে জনগণকে সচেতন করে তোলা
- প্রয়োজনে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাপনার জন্য স্থায়ী ক্লিনিক বা স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবাগ্রহীতাকে প্রেরণ করা

ডিপোহোল্ডারদের সামান্য আয়েরও ব্যবস্থা রয়েছে। তাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ি, কনডম এবং খাবার স্যালাইন বিক্রি করে

ডিপোহোল্ডারগণ সেবাগ্রহীতাদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সেবা প্রদান করেন

লভ্যাংশের অর্ধেক টাকা পায়; আবার সেবাগ্রহীতাকে স্থায়ী বা স্যাটেলাইট ক্লিনিকে প্রেরণ করে নির্দিষ্ট হারে সার্ভিস চার্জের শেয়ার পান। এছাড়া প্রত্যেক ডিপোহোল্ডার প্রতিমাসে ৩০০.০০ টাকা সম্মানী ভাতা পান।

মোসাম্মৎ সাহেরা খাতুন শেরপুরে মালঞ্চ সেবা সমিতিতে কর্মরত একজন ডিপোহোল্ডার। তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তথাপি একজন দক্ষ কর্মী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর স্বামী একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তিনি এক ছেলে ও দুই মেয়ের জননী। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। তিনি একমাসে জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ি, কমডম ও খাবার স্যালাইন বিক্রি করে লভ্যাংশের শেয়ার বাবদ ১৮০.০০ টাকা পেয়েছেন এবং মাসিক সম্মানী ভাতা বাবদ ৩০০.০০ টাকা পেয়েছেন, অর্থাৎ মাসে মোট ৪৮০.০০ টাকা আয় করেছেন। তাঁর আয় সামান্য হলেও তাতে সংসারের উপকারে আসছে বলে জানিয়েছেন।

২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে সাহেরা খাতুন ডিপোহোল্ডার হিসেবে ৭ দিনের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ২০০৩ সালের জুন মাসের মধ্যে তিনি নিম্নলিখিত সেবা প্রদান করেছেন বলে জানিয়েছেন:

- ❒ জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ি ও কনডম সরবরাহ করেছেন
- ❒ গর্ভবতী মা, কিশোর-কিশোরীদের এবং বাচ্চাদের টিকা সম্বন্ধে বলেছেন এবং টিকা গ্রহণের জন্য মা ও শিশুদের ক্লিনিকে প্রেরণ করেছেন
- ❒ স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার জন্য দম্পতি রেজিস্টারে দম্পতিদের তালিকাভুক্তি করেছেন
- ❒ স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠনে অংশগ্রহণ করেছেন
- ❒ মাসিক প্রতিবেদন তৈরি ও মাসিক সভায় অংশগ্রহণ করেছেন
- ❒ গর্ভবতী মায়েদের সেবা ও গর্ভোত্তর সেবা সম্বন্ধে মায়েদের সাথে আলাপ করেছেন

তিনি উপরোক্ত কর্মকাণ্ডের জন্য এলাকার চেয়ারম্যান, মেম্বার, মসজিদের ঈমাম, শিক্ষক ও কমিশনার-এর সাথে যোগাযোগ রাখেন এবং তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। কাস্টমারদের সাথে সাধারণত সকাল ১০-১১.০০টার মধ্যে বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। কর্মসূচিতে তাঁর অন্তর্ভুক্তি অল্প কয়েক মাস হয়েছে, কাজেই এই স্বল্পপরিসরে তাঁর কাজের অগ্রগতির মূল্যায়ন করা দুরূহ। তা সত্ত্বেও তিনি একমাসে যে পরিমাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন তা হলো:

মিনিকন - ৬ চক্র
ফেমিকন - ১২ চক্র
সুখী - ২৩ চক্র
খাবার স্যালাইন - ২০ প্যাকেট

একজন ডিপোহোল্ডার হিসেবে কাজটি তাঁর পছন্দ কি না এ-ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন: "এটা সমাজসেবার কাজ। আমি এ-কাজের কারণে সবার সাথে কথা বলতে পারি। মহিলা হিসেবে চাকুরি করছি, তাই গর্ববোধ করছি। ক্লিনিকে আগে রোগী হিসেবে আসতাম। এখন চাকুরি করি, তা নিয়ে গর্ব করি।"

ডিপোহোল্ডার হিসেবে যতদিন তাঁকে কাজে রাখা হবে ততদিন তিনি কাজ করে যাবেন বলে আশা রাখেন, কারণ তাঁর কাজটা ভালো লাগে। সেবার মান বাড়ানোর ব্যাপারে তাঁর মতামত হলো: তাঁকে আরো ভালো করে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। ডিপোহোল্ডার হিসেবে এলাকায় তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে জ্বরের ওষুধ ও ভিটামিন বিক্রির জন্য তাঁকে অনুমতি দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন, যা তাঁর আয় বৃদ্ধিতেও সাহায্য করবে।

অনিবার্য কারণবশত ১৪১০ বঙ্গাব্দে স্বাস্থ্য সংলাপ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। তিন সংখ্যা একত্রে বর্ধিত আকারে প্রকাশ করা হলো এবং এখন থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। পাঠকদের অসুবিধার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত

সম্পাদক

ডায়রিয়া-আক্রান্ত ছোট শিশুদের জন্য

নতুন জিঙ্ক টেবলেট

মুল নিবন্ধ: রালফ আর্নস্ট, অনুবাদ: এম.এ. রহীম

ডায়রিয়া-আক্রান্ত হয়ে মারা যেতো, সারা বিশ্বে এমন হাজার হাজার শিশুর জীবন বাঁচানোর অঙ্গীকারসহ গৃহীত একটি চাঞ্চল্যকর ও সৃষ্টিশীল প্রকল্পের সূচনাস্থল হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। প্রকল্পটির ইংরেজি নাম ''স্কেলিং আপ জিঙ্ক ট্রিটমেন্ট ফর ইয়ং চিলড্রেন উইথ ডায়রিয়া'-- সংক্ষেপে 'সুজি' [বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় 'ডায়রিয়া আক্রান্ত ছোট শিশুদের জন্য জিঙ্ক-ব্যবহার ব্যাপ্তিবর্ধন প্রকল্প']।

বিল এন্ড মেলিন্ডা গেইটস ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহযোগিতায় আইসিডিডিআর,বি বাংলাদেশে এই প্রকল্প বাস্তাবায়িত করবে। সফল হলে সারা বিশ্বে তা বাস্তবায়িত হবে।

উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি মারাত্মক রোগ ডায়রিয়া, যার ফলে প্রতিবছর প্রায় বিশ লক্ষ শিশু প্রাণ হারায়। গবেষণায় দেখা গেছে, ওষুধ আকারে দস্তা (জিঙ্ক) প্রয়োগ ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খুবই কার্যকর, বিশেষত পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে। জিঙ্ক প্রয়োগের ফলে ডায়রিয়ার প্রচণ্ডতা এবং স্থায়িত্ব যেমন কমে আসে, তেমনি ভবিষ্যতে ডায়রিয়া-আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা এবং হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস পায়। এর ফলে ডায়রিয়াজনিত রোগের কবল থেকে যেমন শিশুর জীবন রক্ষা পায়, তেমনি ভবিষ্যতে সংক্রামক রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

নিউমোনিয়া রোগ দমনেও জিঙ্ক-এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে, যদিও এ-বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন। তৃতীয় বিশ্বে বসবাসকারী শিশুদের মৃত্যুর একটি সাধারণ কারণ হিসেবে নিউমোনিয়াও উল্লেখযোগ্য। অতএব ওষুধ হিসেবে জিঙ্ক-এর প্রয়োগ সারা বিশ্বে বিপুল সম্ভাবনাময় একটি জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম হতে পারে। ইতোমধ্যে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, গত কয়েক দশকে, বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বের বহু লোক দুভার্গ্যজনকভাবে তাদের শরীরে জিঙ্ক-এর অভাবজনিত সমস্যায় ভুগছে।

খাওয়া শুরু করলে অসুখ সেরে গেলেও পূর্ণ মাত্রায় অর্থাৎ প্রতিদিন একটি করে দশ দিনে এক প্যাকেটের দশটি টেবলেট খেতে হবে। জিঙ্ক টেবলেটের প্যাকেট হাতে সুজি প্রকল্পের তথ্য প্রচার-বিষয়ক কনসালট্যান্ট এবং এ-নিবন্ধের মূল লেখক রালফ আর্নস্ট-কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে

জিঙ্ক মানবদেহের একটি অণুখাদ্য, যা লাল মাংস, মুরগির মাংস, বাদাম ও দুধ থেকে তৈরি খাবার, ইত্যাদি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যদ্রব্য থেকে পাওয়া যায়। মানবদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এবং অসুস্থতা ও রোগ-ব্যাধির আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য জিঙ্ক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অনেক মানুষ প্রয়োজন মোতাবেক জিঙ্কসমৃদ্ধ খাবার খেতে পারে না। এতে শরীরে জিঙ্ক-স্বল্পতা দেখা দেয়, যা পরিণামে শরীরের বৃদ্ধি-প্রক্রিয়া ব্যাহত করে এবং রোগ-ব্যাধির প্রকোপ বেড়ে যায়। বিশেষত ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে তা বেশি ঘটে থাকে।

যদিও ইতোমধ্যে জিঙ্ক-এর সুফল সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছুই জেনেছি এবং বেশকিছু গবেষণা প্রকল্পে ওষুধ হিসেবে জিঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে, তবুও জিঙ্ক-কে ডায়রিয়া রোগের চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় নি। 'সুজি' প্রকল্প এই কাজটি সমাধা করতে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ডায়রিয়া-আক্রান্ত পাঁচ বছরের কম-বয়সী সকল শিশুর চিকিৎসায় ওষুধ আকারে জিঙ্ক-এর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২০০৫ সালের প্রথমদিকে টেবলেট আকারে বাংলাদেশে জিঙ্ক পাওয়া যাবে। জিঙ্ক

চামচে পানি নিয়ে তাতে জিঙ্ক টেবলেট ছেড়ে দিলে খুব দ্রুত টেবলেট গলে গিয়ে সিরাপের মতো তরল দ্রবণ তৈরি হয়

টেবলেট বাজারজাত করবে অনেক প্রতিষ্ঠান। সোশাল মার্কেটিং কোম্পানী (এসএমসি) তাদের বিক্রয়কর্মীদের নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে এবং এনজিও সার্ভিস ডেলিভারি প্রোগ্রাম তাদের নির্ধারিত ওষুধের দোকানের মাধ্যমে জিঙ্ক টেবলেট বিক্রয় করবে। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমেও এগুলো সরবরাহ করা হবে।

জিঙ্ক টেবলেট বাজারজাতকরণের জন্য একটি অভিযানের রূপরেখা তৈরি হচ্ছে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজারে পর্যাপ্ত জিঙ্ক টেবলেট সরবরাহ এবং ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুদের জীবন রক্ষার জন্য এই টেবলেট কতটা উপকারী সে-সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

আইসিডিডিআর,বি'র প্রাথমিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাজারে অনেক ধরনের জিঙ্ক সিরাপ পাওয়া যায় এবং শরীর বর্ধন, দুর্বলতা কমানো, ক্ষুধা বৃদ্ধি, হজমশক্তি বাড়ানো, ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এগুলো প্রেসক্রাইব করা হয়, তবে ডায়রিয়ার চিকিৎসায় এগুলো কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। স্বল্পসংখ্যক চিকিৎসক এবং এর চেয়েও কমসংখ্যক ওষুধের দোকান ও ফার্মেসি ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিঙ্কের সুফল সম্পর্কে অবহিত।

আইসিডিডিআর,বি'র 'সুজি' প্রকল্পের প্রধান ড. চার্লস লারসন মন্তব্য করেছেন:

''আমরা আমাদের ওষুধ যদিও টেবলেট আকারে বাজারে ছাড়ছি, সিরাপ আকারে যা পাওয়া যায় তা প্রয়োগের ব্যাপারেও আমরা জনগণকে উৎসাহিত করবো যদি তারা তাদের ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুদের জন্য সিরাপকে বেশি পছন্দ করে থাকেন। আমাদের প্রথম ও প্রধান কামনা জনগণ তাদের অসুস্থ শিশুদের চিকিৎসায় জিঙ্কজাতীয় ওষুধ ব্যবহার করুক, কারণ তা শিশুদের জীবন রক্ষা করে। জনগণ আমাদের টেবলেট ব্যবহার করলো না কি অন্য কারো ওষুধ ব্যবহার করলো তা আমাদের ভাবনার বিষয় নয়।''

আইসিডিডিআর,বি যে তিনটি কারণে সিরাপের বদলে টেবলেট আকারে জিঙ্ক ব্যবহার করতে আগ্রহী সেগুলো হলো:

- ❒ টেবলেটের উৎপাদন খরচ কম
- ❒ খাওয়ানোর সময় সঠিক পরিমাপ করা সুবিধাজনক
- ❒ ব্যবহার, পরিবহন ও সংরক্ষণ করা সহজতর

'সুজি' প্রকল্পের মাধ্যমে যে ওষুধ বাজারে ছাড়া হচ্ছে মূলত তা হচ্ছে গুঁড়া করার উপযোগী ২০ মিলিগ্রামের একটি টেবলেট, যা চামচের সামান্য পানিতে গুলা যায়। এক পাতায় দশটি টেবলেট আছে। প্রতিদিন একটি করে দশ দিনে ১০টি টেবলেট খেতে হবে।

জিঙ্কজাতীয় ওষুধের মধ্যে সাধারণত যে ধাতব গন্ধ থাকে, পানিতে গুলিয়ে নিলে আমাদের নতুন ওষুধে তা থাকে না, বরং সুস্বাদু ভেনিলার গন্ধ পাওয়া যায়। নিউট্রিসেট নামের একটি ফরাসী কোম্পানী এতে সুগন্ধ যুক্ত করেছে।

প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে নিউট্রিসেট এই টেবলেট ফ্রান্স থেকে পাঠাবে। শেষে বাংলাদেশেও এই টেবলেট উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। আগ্রহী কিছু স্থানীয় কোম্পানীর সঙ্গে নিউট্রিসেট ও আইসিডিডিআর,বি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। ড. চার্লস লারসন বলেছেন:

''এভাবে 'সুজি' প্রকল্প বাংলাদেশীদের জন্য চাকুরির সুযোগ তৈরি করে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে পারে।'' ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশে এই টেবলেট জনপ্রিয় হয়ে উঠলে উৎপাদক হিসেবে বাংলাদেশ তার রপ্তানিপণ্যের তালিকায় একে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।''

ওষুধ আকারে জিঙ্ক ব্যবহারের ব্যাপ্তি বাড়ানোর জন্য গৃহীত সকল কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপনা, বাজার সৃষ্টির অভিযানে গৃহীত কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন, টেবলেট উৎপাদন ও তথ্য সরবরাহ ছাড়াও এ-প্রকল্প কিছু গবেষণা কার্যক্রমও অঙ্গীভূত করেছে।

বর্তমানে আইসিডিডিআর,বি'র গবেষকগণ ডায়রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় বিশ্বাস, রোগের অবস্থা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দমালা, ডায়রিয়ার চিকিৎসা-সংক্রান্ত ধারণা, বিশেষত জিঙ্কজাতীয় ওষুধ গ্রহণের প্রতি জনগণের মনোভাব খতিয়ে দেখছে। কারো ডায়রিয়া হলে লোকজন

আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতালে (মহাখালির কলেরা হাসপাতালে) চিকিৎসারত একজন রোগীর মায়ের কাছে জিঙ্ক টেবলেটের কার্যকারিতা ও নিরাপত্তার কথা বুঝিয়ে বলছেন এ-হাসপাতালের অন্যতম ডাক্তার ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানী আলী মিরাজ খান

কীভাবে তার সামাল দেয়, কী কী করে এবং কেন তা করে এ-বিষয়ে শহর ও গ্রামাঞ্চলে জনগণের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত আইসিডিডিআর,বি-তে কর্মরত নৃতাত্ত্বিক ড. লরেন ব্লাম মন্তব্য করেছেন:

"সাক্ষাতকার গ্রহণের এই প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করবে, যা বিশেষ করে আমাদের ওষুধের বাজার সৃষ্টির অভিযানে কাজে লাগবে। ডায়রিয়া সম্পর্কে মানুষ কী জানে এবং এর চিকিৎসার জন্য কী করাটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তা আমাদের জানতে হবে। কেবল তখনই আমরা বুঝতে পারবো, আমরা আমাদের ওষুধের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের আচরণ পবির্তনের জন্য আমরা তাদের কী বলবো।"

> ২০০৫ সালের প্রথমদিকে টেবলেট আকারে বাংলাদেশে জিঙ্ক পাওয়া যাবে। জিঙ্ক টেবলেট বাজারজাত করবে অনেক প্রতিষ্ঠান। সোশাল মার্কেটিং কোম্পানী (এসএমসি) তাদের বিক্রয়কর্মীদের নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে এবং এনজিও সার্ভিস ডেলিভারি প্রোগ্রাম তাদের নির্ধারিত ওষুধের দোকানের মাধ্যমে জিঙ্ক টেবলেট বিক্রয় করবে. . .

অন্য একটি গবেষণা প্রকল্পে জিঙ্ক টেবলেটের জৈবিক নিরাপত্তার দিকটি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। যদিও অনেক পরীক্ষাকার্যে জিঙ্ক জাতীয় ওষুধ ব্যবহৃত হয়েছে এবং কোনো মারাত্মক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার খবর পাওয়া যায় নি, তবুও ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রেসক্রাইব করার আগে যেকোনো ওষুধের সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি গুণগত ও পরিমাণগত দৃষ্টিকোণ থেকে সনাক্ত ও যাচাই করে নেয়া দরকার। এ-উদ্দেশ্যে ঢাকার দু'টি হাসপাতালকে জিঙ্কজাতীয় ওষুধ প্রয়োগের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়ার জন্য প্রদেয় আদর্শ স্বাস্থ্যসেবার কাঠামোর মাধ্যমেই তা বাস্তবায়িত হবে। জিঙ্কজাতীয় ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে এমন সকল শিশুকে, বিশেষ করে যাদের অত্যধিক ও অস্বাভাবিক বমি হয় এমন শিশুদের সবাইকে পরিবীক্ষণে রাখা হবে। বার্ষিক রোগীভর্তির অতীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে আশা করা যায়, নির্বাচিত দু'টি হাসপাতালে ৬০,০০০ শিশুকে জিঙ্কজাতীয় ওষুধ প্রয়োগ ও তার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার পরীক্ষার জন্য পাওয়া যাবে। জৈবিক নিরাপত্তার পরিবীক্ষণ ২ মাস যাবত চলবে।

স্বাদ এবং প্রয়োগের পদ্ধতি (টেবলেট বনাম সিরাপ)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে জনগণের মনোভাব পরীক্ষার জন্য আরো একটি গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে যেসব শিশুকে জিঙ্কজাতীয় ওষুধ খাওয়ানো হবে তাদের সেবাদানকারীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে এ-কথা জানার জন্য যে, তারা হাসপাতাল থেকে চলে যাওয়ার পরও নির্দেশ মোতাবেক জিঙ্কজাতীয় ওষুধ খাওয়ানো অব্যাহত রেখেছে কি না; খাওয়ালে কতদিন ধরে খাওয়ানো হয়েছে এবং কী কী কারণ এই নির্দেশ গণ্য করার পেছনে কাজ করেছে। গ্রহণযোগ্যতা, ওষুধ-ব্যবহার অব্যাহত রাখা ও নির্দেশ গণ্য করা-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য গবেষক দল ১,৬০০ শিশুকে নির্বাচন করবে।

সবশেষে প্রকল্পের সার্বিক কর্মদক্ষতা ও প্রভাব মূল্যায়নের জন্য কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হবে। এ-মূল্যায়নে প্রধানত যেসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করা হবে তা হচ্ছে: জিঙ্কজাতীয় ওষুধের ব্যাপ্তি বাড়ানোর কর্মকাণ্ড কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে কি না অর্থাৎ ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসায় এই ওষুধ কতটা ব্যবহৃত হচ্ছে, অন্যান্য চিকিৎসা-পদ্ধতির ওপর এর কী প্রভাব পড়েছে। এসব প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত আরেকটি বিষয় হলো এসব কর্মকাণ্ড সমতার দিক থেকে সর্বত্রগামী কি না: কোনো পরিবারের আয়ভেদে, স্থান ও সেবাদানকারীভেদে জিঙ্কজাতীয় ওষুধ গ্রহণে কোনো তারতম্য দেখা যায় কি না।

২০০৪ সালের ১৯ ও ২০ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে এ-প্রকল্পের প্রাথমিক ফলাফল পেশ করা হয়েছে।

'সুজি' প্রকল্প বিষয়ে আরো তথ্যের জন্য, গবেষণা কর্মসূচি ও জিঙ্ক টেবলেটের প্রবর্তন বিষয়ে হালনাগাদ খবরাখবর সরবরাহের জন্য আইসিডিডিআর,বি ইন্টারনেটে (<*http://www.icddrb.org/activiy/SUZY*>) নামের একটি নতুন ওয়েব পেজ সংযোজিত করেছে।

আর্সেনিকজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

চন্দ্র শেখর দাস
মোঃ আনিসুর রহমান

আর্সেনিক একটি মৌলিক পদার্থ। এর ধাতব এবং অধাতব উভয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। একারণে আর্সেনিককে অপধাতু (Metalloid) বলা হয়। বিভিন্ন খনিজ, বিশেষ করে আগ্নেয়শিলা, আকরিক, লোহা, তামা, টিন, ইত্যাদির সাথে আর্সেনিক বিদ্যমান। প্রকৃতিতে জৈব এবং অজৈব দু'ধরনের আর্সেনিক আছে। তবে জৈব থেকে অজৈব আর্সেনিকই মানুষের জন্য বেশি ক্ষতিকর।

ভূ-গর্ভস্থ পানিতে যে-আর্সেনিক থাকে সেটি হলো অজৈব আর্সেনিক। দীর্ঘদিন যাবৎ এই আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করলে দেখা দেয় নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ও বাংলাদেশ সরকারের হিসাবমতে, নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণীয় মাত্রা আমাদের দেশের জন্য ০.০৫ মি: গ্রাম/লিটার। তবে ইউরোপীয় বহু দেশ ও জাপানসহ আরো কিছু উন্নত দেশে এর গ্রহণীয় মাত্রা হলো ০.০১ মি: গ্রাম/লিটার। নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা ০ থেকে ০.০৫ মি: গ্রাম/লিটার পর্যন্ত হলে আমরা সাধারণত সেটিকে নিরাপদ মনে করি। মাঠকর্মীগণ এমন নলকূপের মুখে সবুজ রং লাগিয়ে খাবারযোগ্য বলে ঘোষণা দেয়; আর, কোনো নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা ০.০৫ মি: গ্রাম/লিটারের অধিক হলেই সেটিকে লাল রঙে চিহ্নিত করে বুঝানো হয় যে, নলকূপের পানি বেশিমাত্রায় আর্সেনিক দূষণযুক্ত এবং উক্ত পানি পান করা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ভিতর প্রায় ৬০টি জেলায় বসবাসরত প্রায় ৫ কোটি লোক কমবেশি আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত। তবে সর্বাপেক্ষা বেশি দূষণযুক্ত হলো চাঁদপুর জেলা। এ-জেলার মতলব থানার আইসিডিডিআর,বি-এর গবেষণাধীন এলাকার ১৪২টি গ্রামে আর্সেনিকজনিত একটি গবেষণা কার্যক্রম চালানোর সময় দেখা গেছে, অত্র এলাকায় ৬৫% নলকূপের পানিতে বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিক বিদ্যমান এবং পাঁচ বছরের চেয়ে বেশি বয়সের ১ লাখ ৬৬ হাজার লোকের মধ্যে এক জরিপে প্রায় ৫০৪ ব্যক্তি ইতোমধ্যে আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ-তথ্য থেকে বাংলাদেশে আর্সেনিকের ভয়াবহতা সহজে অনুমেয়।

আর্সেনিকজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা

দীর্ঘদিন যাবত আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করার ফলে ধীরে ধীরে মানুষ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, সাধারণত সর্বনিম্ন ৬ মাস থেকে সর্বোচ্চ ২০ বছর পর্যন্ত আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করলে মানুষের শরীরে এর বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এটি নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের পুষ্টিগত অবস্থা, খাবার পানিতে কী পরিমাণ আর্সেনিক আছে এবং কতদিন যাবত এই দূষণযুক্ত পানি পান করছেন তার ওপর।

আর্সেনিকজনিত স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ত্বক, বিশেষ করে বুকে ও পিঠে ছিটছিটে কালো কালো দাগ (Melanosis) হওয়া, হাত ও পায়ের তালু শক্ত ও খসখসে হওয়া, এমনকি ছোট ছোট আঁচিলের মত গুটি (Keratosis) হওয়া। ক্ষেত্রবিশেষে আক্রান্ত ব্যক্তির চোখ লাল হতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে খুব দূর্বল মনে করেন। গবেষণায় দেখা গেছে, আক্রান্ত ব্যক্তি দীর্ঘস্থায়ী কাশি, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্রসহ নানাবিধ জটিলতায় আক্রান্ত হতে পারেন, এমনকি আর্সেনিকে আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভপাতের ঝুঁকি থেকে যায় এবং জন্ম-নেওয়া শিশুটির জটিল এবং দূরারোগ্য রোগ হতে পারে। ত্বকের ক্যান্সার ছাড়াও ফুসফুস, মূত্রনালী, মুত্রথলি, এমনকি যকৃতের ক্যান্সারও হতে পারে।

তিন কলসীবিশিষ্ট এই ফিল্টার পদ্ধতিতে পানিকে আর্সেনিকমুক্ত করে পান ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে

স্টিলের তৈরি উন্নতমানের এ্যালকান ফিল্টার ব্যবহার করে আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যেতে পারে

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

আর্সেনিকজনিত বিষক্রিয়া থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রথম এবং প্রধান করণীয় হলো আর্সেনিকমুক্ত পানি পান করা এবং টাটকা শাক-সব্জি, ফলমূল এবং আমিষজাতীয় পুষ্টিকর খাবার খাওয়া। নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি উৎস থেকে আমরা আর্সেনিকমুক্ত পানি পেতে পারি:

১. আর্সেনিকমুক্ত সবুজ নলকূপের পানি: বাড়িতে যদি কোনো সবুজচিহ্নিত বা আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ থাকে, তবে আমরা পান করা বা রান্নার কাজে সে-পানি ব্যবহার করতে পারি। বাড়িতে না থাকলেও যদি নিকটবর্তী বা পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর কোনো সবুজ নলকূপ থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সেই পানিও ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

২. নদ-নদী, পুকুর বা জলাশয়ের পানি ফুটিয়ে পান করা: বাড়িতে বা পার্শ্ববর্তী কোনো স্থানে যদি কোনসবুজ নলকূপ না থাকে কিন্তু নিকটবর্তী যদি কোনো নদী, বড় পুকুর বা জলাশয় থাকে, তাহলে আমরা সেই পানি ফুটিয়ে খাবার বা রান্নার কাজে ব্যবহার করতে পারি। সাধারণত নদী বা পুকুরের পানি আর্সেনিকমুক্ত। পুকুর বা জলাশয়ের ক্ষেত্রে একটু দৃষ্টি রাখতে হবে যেন কোনো প্রকার পচনশীল বস্তু না থাকে এবং বাইরে থেকে কোনো প্রকার নালা-নর্দমা থেকে ময়লা পানি পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে। যেসব পুকুরে সার প্রয়োগে মাছ চাষ করা হয় কিংবা কাপড় ধোঁয়া বা গোসল করা হয় সেসব পুকুরের পানি ব্যবহার করা যাবে না। নদী বা সংরক্ষিত পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করে প্রথমে এক টুকরো কাপড়ের সাহায্যে ছেঁকে নিতে হবে। এতে করে প্রাথমিকভাবে ময়লা আবর্জনা থাকলে সেটা দূর হয়ে যাবে। তারপর পানিটুকু একটা বড় পাত্রে ফুটাতে হবে। পানি ফোটা শুরু হলে তখন থেকে আরো ৩০ মিনিট ফুটাতে থাকুন। অতপর পানিকে একটি কলসীতে সংগ্রহ করে খাওয়া ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায়। পানি একটু ঘোলাটে হলে এক টুকরো ফিটকিরি এক টুকরো কাপড়ে বেঁধে ১/২ বার কলসীর পানির ভিতর নেড়ে নিতে পারি। তাহলে তলানী হিসেবে ময়লা কলসীর নিচে জমা হবে। সেক্ষেত্রে শুধু কলসের উপরিভাগের পানিটুকু ব্যবহার এবং নিচের অংশ পরিত্যাগ করতে হবে।

৩. পুকুর বা নদীর পারে বিশেষভাবে নির্মিত বালুর ফিল্টার (Pond or River Sand Filter): এই পদ্ধতিতে নদী বা উপরোল্লিখিত সংরক্ষিত পুকুর থেকে পানি সরাসরি ফিল্টারে নেওয়া হয়। এই বিশেষ ফিল্টারটি ৫টি চেম্বারবিশিষ্ট। প্রথম যে-চেম্বারে পানি নেওয়া হয় সেটির ভিতর মাঝারি এবং ছোট ছোট সাইজের ইটের টুকরো থাকে, যাতে করে প্রাথমিক ময়লা ও আবর্জনা ফিল্টার হয়ে যায়। দ্বিতীয় চেম্বারে ছোট ইটের টুকরো থাকে। ফলে আরো ময়লা দূরীভূত হয়। তৃতীয় চেম্বারের উপরিভাগে অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত একটা পাটাতন থাকে। পানি দ্বিতীয় চেম্বার থেকে ৩য় চেম্বারে ছিদ্রযুক্ত পাটাতন দিয়ে ছাঁকুনি হয়ে তৃতীয় চেম্বারের নিচে পতিত হয়। তৃতীয় চেম্বার থেকে পানি যায় চতুর্থ চেম্বারে। চতুর্থ চেম্বারে আরো ছোট ইটের টুকরোর ভিতর দিয়ে পানি আসে পঞ্চম চেম্বারে। পঞ্চম চেম্বারটি সবচেয়ে বড়। পঞ্চম চেম্বারের সবচেয়ে নিচে থাকে আস্ত ইটের স্তর। তার উপরিভাগে মাঝারি ও ছোট সাইজের ইটের স্তর। তার উপরিভাগে মোটা বালু (সিলেট স্যান্ড) এবং সর্বোচ্চ উপরিভাগে থাকে চিকন বালুর স্তর। পঞ্চম চেম্বারের সঙ্গে দু'টি পানি সংগ্রহের জন্য ট্যাপ লাগানো হয় এবং সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করা হয়।

আইসিডিডিআর,বি এবং ব্র্যাক-এর যৌথ উদ্যোগে মতলবে গবেষণাভুক্ত এলাকায় এমন ১৮টি বালুর ফিল্টার তৈরি করা হয়েছে। এমন একটি বালুর ফিল্টারের নির্মাণ ব্যয় প্রায় ৩৫,০০০.০০ টাকা এবং একটি গ্রামের প্রায় ১০০টি পরিবার এ-থেকে সারা বছর খাবার ও রান্নার পানি সংগ্রহ করতে পারে। চেম্বারের কাঁচামাল ইট এবং বালু মাঝে মাঝে পরিষ্কার করলে এটি দীর্ঘদিন ব্যবহারের উপযোগী থাকে। এই হিসেবে একটি বালুর ফিল্টার রক্ষণাবেক্ষণে বার্ষিক খরচ মাত্র ৪০০.০০ টাকা। এই পদ্ধতিটি কার্যকর করতে হলে ব্যক্তিগত উদ্যোগের চেয়ে প্রয়োজন সমাজের সমন্বিত উদ্যোগ।

৪. বৃষ্টির পানি: বৃষ্টির পানি প্রকৃতির দান এবং আর্সেনিকমুক্ত। আমরা সম্পূর্ণ নির্ভয়ে তা পান করতে পারি। বর্ষা মৌসুমে আমরা প্রায় ৪/৫ মাস অতি সহজেই আমাদের পানির প্রয়োজন এই উৎস থেকে মেটাতে পারি। বৃষ্টির শুরুর ৫ মিনিট পর থেকে আমরা আমাদের ঘরের টিনের চাল থেকে এ-পানি সংগ্রহ করতে পারি। টিনের চাল না থাকলে এক টুকরো বড় কাপড় চারটি লাঠির সঙ্গে টানিয়ে মাঝখানে একটু ভারী ইটের টুকরো রেখে পানি ঠিক একটি নিদিষ্ট স্থানে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নিদিষ্ট স্থানে একটি পরিষ্কার বড় পাত্র রেখে আমরা প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করতে পারি।

৫. বৃষ্টির পানির সংরক্ষণাগার (Rain-water Harvester) : বর্ষাকালে আমরা বৃষ্টির পানি কোনো বড় সংরক্ষণাগারে জমিয়ে রেখে শুকনো মৌসুমে ব্যবহার করতে পারি। এক্ষেত্রে টিনের চালের কিনারা বরাবর একটি টুমা লাগিয়ে একটি সংযোগের সাহায্যে পানি প্রথমে সংরক্ষণাগারে নিতে হবে। সাধারণত যে-ছিদ্র দিয়ে সংরক্ষণাগারে পানি জমানো হয় সেটি বৃষ্টি শুরুর প্রথম ৫ মিনিট বন্ধ রেখে তারপর থেকে পানি জমানো হয়, কারণ ময়লা আবর্জনাযুক্ত পানি রাখলে পানি দুর্গন্ধযুক্ত হবে এবং তা পরবর্তী কালে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। যে-টিনের চাল থেকে পানি সংগ্রহ করতে হবে সেটির ওপর যেন কোনো গাছপালা, লতাপাতা না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মতলবে আইসিডিডিআর,বি গবেষণাভুক্ত এলাকায় প্রায় ৬০টি সিমেন্ট দিয়ে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার তৈরি করা হয়েছে। একটি ৩২০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সংরক্ষণাগার তৈরির নির্মাণ ব্যয় প্রায় ১০,০০০.০০ টাকা। এই পদ্ধতিটি একটি পরিবার-ভিত্তিক ব্যবস্থা এবং ৪/৫ জন সদস্যবিশিষ্ট কোনো পরিবার প্রায় ৫ মাসের পানির চাহিদা এর মাধ্যমে মেটাতে সক্ষম।

৬. তিন কলসীবিশিষ্ট ফিল্টার পদ্ধতি: এই পদ্ধতির সাহায্যে আর্সেনিকযুক্ত পানিকে আর্সেনিকমুক্ত করা যায়। এই পদ্ধতিতে চারটি মাটির কলস একটির ওপর আরেকটি কোনো স্ট্যান্ডের সাহায্যে সাজিয়ে রাখা হয়। ওপরের তিনটি কলসী ছিদ্রযুক্ত। সবচেয়ে ওপরের কলসীতে থাকে ইটের কণা এবং সিলেটের মোটা বালি। দ্বিতীয় কলসীতে থাকে চিকন বালি, সিলেটের মোটা বালি এবং লোহার গুঁড়ার মিশ্রণ, তৃতীয় কলসীতে থাকে শুধু কাঠকয়লা। আর্সেনিকযুক্ত পানি প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কলসীর মাধ্যমে ফিল্টার হয়ে সবচেয়ে নিচের কলসীতে আর্সেনিকমুক্ত অবস্থায় ফোঁটায়-ফোঁটায় জমা হয়। পদ্ধতিটি পরিবার-ভিত্তিক এবং এক-কালীন নির্মাণ খরচ প্রায় ৫০০.০০ টাকা এবং বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ খরচ খুব কম।

৭. এ্যালকান (Alcan) ফিল্টার: এই পদ্ধতির সাহায্যেও আর্সেনিকযুক্ত পানিকে আর্সেনিকমুক্ত করা হয়। এটি ওপর থেকে নিচের দিকে সাজানো ৩ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট স্টিলের তৈরি একটি পাত্রবিশেষ। ওপর থেকে নিচের দিকে প্রথম প্রকোষ্ঠটি ফাঁকা যেখানে আর্সেনিকযুক্ত পানি ঢালা হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকোষ্ঠে ৩ কেজি পরিমাণে মোট ৬ কেজি এ্যাকটিভেটেড এ্যালুমিনাম থাকে। প্রথম প্রকোষ্ঠ থেকে পানি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকোষ্ঠের মাধ্যমে ফিল্টার হয়ে আর্সেনিকমুক্ত হয় এবং সবচেয়ে নিচের (তৃতীয়) প্রকোষ্ঠের নিচের দিকে একটি ট্যাপ লাগিয়ে পানি সংগ্রহ করা হয়। এই পদ্ধতির নির্মাণ ব্যয় প্রায় ৩০০০.০০ টাকা এবং দু'বছর অন্তর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ৭০০.০০ টাকা। প্রায় ১১,০০০.০০ লিটার পানি ফিল্টার করার পর এর উপাদান এ্যালুমিনা পরিবর্তন করা হয় এবং নতুন করে ৬ কেজি এ্যালুমিনা যোগ করা হয়।

বৃষ্টির পানি আর্সেনিকমুক্ত। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি এধরনের সংরক্ষণাগারে জমিয়ে আর্সেনিকমুক্ত পানি পাওয়া যেতে পারে

ব্যাপকভাবে আর্সেনিকযুক্ত নলকূপের পানি ব্যবহার করায় বাংলাদেশের জনগণ পৃথিবীর সবচাইতে বড় গণবিষক্রিয়ার সম্মুখীন। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ-অবস্থার উত্তরণ ঘটানো সম্ভব।

বাংলাদেশ এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠী

এ.এইচ. নওশের উদ্দীন

১৯৫০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২০৫ মিলিয়ন (৮.২ শতাংশ) ছিলো প্রবীণ অর্থাৎ ৬০ বছর বা এর চেয়ে বেশি বয়সী এবং নবীনদের (১৫ বছরের কম-বয়সী) হার ছিলো ৩৪.৩ শতাংশ। ২০০০ সালে প্রবীণদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিলো মোট জনসংখ্যার ৬০৬ মিলিয়ন (১০ শতাংশ) এবং নবীনদের আনুপাতিক হার ছিলো ৩০ শতাংশ। ২০৫০ সাল নাগাদ প্রবীণদের সংখ্যা হবে ২ বিলিয়ন (২১ শতাংশ) এবং তা প্রথমবারের মত নবীনদের সংখ্যা অর্থাৎ ১৫ বছরের কম-বয়সীদের সংখ্যাকে অতিক্রম করবে।

এশিয়া মহাদেশে ১৯৫০ সালে ষাটোর্দ্ধ বয়সের প্রবীণদের সংখ্যা ছিলো মোট জনসংখ্যার ৬.৮ শতাংশ এবং ২০৫০ সালে এই হার বেড়ে হবে ২২.৬ শতাংশ। প্রজনন হার হ্রাস, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাফল্য, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং মৃত্যুহার হ্রাস এই পরিবর্তনের মূল কারণ। প্রবীণ জনসংখ্যার এই ক্রম-বৃদ্ধির ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক, পারিবারিক ঐক্য, জীবনধারা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ, শ্রমবাজার, পেনশন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হবে।

প্রবীণ কারা এবং কেন

প্রবীণ বলতে আমরা বুঝি জনসংখ্যার সেই অংশকে বয়োবৃদ্ধির কারণে যাদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং যার ফলে তারা সক্রিয় কর্মজীবন থেকে আংশিক বা সম্পূর্ণ অবসর নিয়েছেন। দেশ এবং কর্মক্ষেত্রভেদে সক্রিয় কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার বয়স বিভিন্ন। তা সচরাচর ৫৫-৬০ বছরের মধ্যেই হয়ে থাকে। জাপানে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই বয়স ৫৫ বছর ছিলো এবং তা বর্তমানে বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। সিঙ্গাপুরে সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে অবসর নেওয়ার বয়স ৬০ বছর। বাংলাদেশে সরকারি চাকুরেদের কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার বয়স ৫৭ বছর। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে ৬০ বছর বেশি-বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে প্রবীণ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের অনেক প্রবীণের মতে প্রবীণ হওয়াটা বয়সের ব্যাপার নয়; মোটামুটি বয়স্ক অবস্থায়ও দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, ভগ্ন স্বাস্থ্য, পাকা চুল এবং লাঠি ভর-করে হাঁটাই প্রবীণদের বৈশিষ্ট্য। মহিলাদের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও রজঃনিবৃত্তি প্রবীণত্বের লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ক্রমবৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে নবীন এবং কর্মক্ষম লোক তথা ১৫-৫৯ বছর-বয়স্ক লোকদের আনুপাতিক সংখ্যা হ্রাস।

বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। আয়তনের দিক থেকে অতি ছোট এই ভূ-খণ্ডটি ধারণ করে আছে পৃথিবীর ৫০ ভাগের এক ভাগ জনসংখ্যা। ২০০০ সালে বাংলাদেশে প্রজনন হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিলো ৩.৩-তে, যা ১৯৭৫ সালে ছিলো ৬.৩ এবং একই সময়ে মৃত্যুর হারও নেমে এসেছে ৮-এ, যা ছিল ১৫। ফলে ১৯৫০ সালে প্রবীন লোকদের অনুপাত ছিলো মোট জনসংখ্যার ৬.২ শতাংশ এবং ২০৫০ সাল নাগাদ এই অনুপাত বেড়ে দাঁড়াবে ১৬ শতাংশে। পাশাপাশি এই সময়ে নবীন জনগোষ্ঠীর হার ৩৮.৭ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়াবে ২২ শতাংশে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ এবং এখানে প্রায় ৬০ শতাংশ পরিবার খাদ্য-সংকটে আছে। বাংলাদেশের প্রবীণদের ৩৭% একা-একা জীবন যাপন করে; তাদের কারো কারো স্ত্রী কিংবা স্বামী নেই। ৬৫ বছরের বেশি বয়সের প্রবীণদের ৩.৯ শতাংশ প্রতিবন্ধী। সম্প্রতি প্রবীণদের ওপর পরিচালিত গবেষণায় তাদের জীবন যাপনের অবস্থা-সম্পর্কিত যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা হচ্ছে:

- ❒ অধিকাংশ প্রবীণ লোক দৈনন্দিন ১/২ বেলা আহার করেন এবং তা-ও প্রায় তরি-তরকাবিহীন
- ❒ তারা সন্তানের সাথে শোবার ঘর ভাগাভাগি করে বসবাস করেন, যা অনেক ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনের জন্য বিঘ্ন সৃষ্টি করে
- ❒ তাঁদের কেউ কেউ কাঁচা-ঘরের বারান্দায় ঘুমান, ফলে ঠাণ্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত হন
- ❒ তাঁদের কারো কারো পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন; টাকা পয়সার ওপর কর্তৃত্ব নেই; নবীনরা তাদের প্রতি সম্মান দেখায় না এবং এড়িয়ে চলে

প্রবীণদের মৌলিক চাহিদাই হচ্ছে খাদ্য এবং ভালো আবাসন। তাঁরা আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও পয়ঃনিস্কাশনের ব্যাপারে নির্মোহ। জনৈকা বৃদ্ধা বলেন, "আমি আমার পরিবারের বোঝা বাড়াতে চাই না, আমার দিন শেষ ওষুধে কী হবে?"

[*আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত*]

ফাইল ছবি: বয়স্ক ও শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র, মনিপুর, গাজীপুর